International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-I, Issue-VII, August 2015, Page No. 16-21
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

শিশুশ্রম : এক সামাজিক সমস্যা

রিয়া চক্রবর্তী

অধ্যাপিকা, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, নহাটা জে. এন. এম. এস. মহাবিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

Abstract

The practice of child labour deprives children of their childhood and is harmful to their physical and mental development. Poverty, lack of good schools and growth of informal economy are considered as the important causes of child labour. In 1998 national census of India estimated the total number of child labour, aged 4-15, to be at 12.6 million, out of a total child population of 253 million in 5-14 age group. In 2009-2010 nationwide survey found child labour prevalence had reduced to 4.98 million children (or less than 2% of children in 5-14 age group). The 2011 national census of India found the total number of child labour, aged 5–14, to be at 4.35 million and the total child population to be 259.64 million in that age group. The child labour problem is not only unique to our country but also it's a worldwide problem, as about 217 million children work, many full-time are facing the situation every day. It's also true that Indian law specifically defines 64 industries as hazardous and it is a criminal offence to employ children in such hazardous industries. UNICEF estimates that India with its larger population has the highest number of child labourers in the world under 14 years of age. In my work I have rather tried to define the main causes of child labour in our country and how can we overcome the problems in our socio-economic structure by the all means of our social kind efforts.

সামাজিক সমস্যা: সমাজকে একটি প্রবাহ হিসাবে সমাজতাত্ত্বিকগণ মনে করেন। অর্থাৎ সমাজ গতিময়, কোথাও থেমে থাকে না। আবার সমাজ ক্রমজটিলতর রূপ লাভ করে। বিবর্তনের ক্রমানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে। মানুষের সমাজ গঠনের অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি, যতই উন্নততর হচ্ছে সমাজের ক্রমজটিলতা ততই উর্ধমুখী হচ্ছে। এগুলি ধারাবাহিকতায় রূপান্তরিত হলে আমরা তাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে উল্লেখ করি। সামাজিক সমস্যা হল এমন একটি সামাজিক পরিস্থিতি যেখানে একটি গোষ্ঠী বা সমাজের একটি অংশ বা শাখা কোন বিশেষ দৃষ্টিকোন থেকে যৌথভাবে সমাজের ক্ষতিসাধন করে। সমাজের প্রচলিত আদর্শ এবং মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র কার্যাবলী দ্বারা সৃষ্ট ঘটনাসমূহ হল সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা হল এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে গোষ্ঠীগত সম্পর্কের ভিত্তিতে মানবীয় আচরণ বঞ্চিত বলে মনে হয় না অথবা যে জনমানসের শৃঙ্খলা রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে সেই সামগ্রিক অবস্থাকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সুতরাং সামাজিক সমস্যাহল সমাজের এমন একটি উদ্ভুত পরিস্থিতি যার দ্বারা—

ক) সমাজ ধারাবাহিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

খ) সমাজের এই সকল ঘটনাবলী প্রচলিত আদর্শ এবং মূল্যবোধ সমূহ থেকে সমাজকে বিচ্যুত করে।

গ) এই সকল ঘটনা সমূহের একটি সাধারণ উৎসভূমি থাকে।

ঘ) উৎসমূলে এই সকল ঘটনাবলীর সঙ্গে সামাজিক কার্য কারণ সম্পর্কিত থাকে।

ঙ) সামাজিক সমস্যাবলীতে ব্যক্তি অন্যতম কারকের ভূমিকা পালন করলেও এগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবেই সংগঠিত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি এক্ষেত্রে অণুঘটকের ভূমিকা পালন করলেও তা গৌন থাকে।

চ) প্রতিটি সামাজিক সমস্যার মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক থাকে।

ছ) বিশ্বের সকল দেশের সকল সমাজেই এই সমস্যাগুলি কম বেশী অবস্থান করে। তবে আর্থসামাজিক দৃষ্টিকোনগুলির উপর সমস্যাগুলির বাস্তবিক রূপ এবং তীব্রতা অনেকখানি নির্ভর করে।

জ) সমাজের অবস্থান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্যাগুলি নতুন নতুন আকার ধারণ করে এবং সমাজের বৃহত্তর অংশের জনমানসকে বিব্রত করে।

সমাজের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় শিশু: সামাজিক সমস্যার অন্যতম অংশ হয়ে দাঁড়ায় এই "শিশু"রা। মানুষের জীবনচক্রের প্রথম পর্যায় হল শৈশব। শৈশব মানবজীবনের প্রত্যুত বলে পরিচিত থাকে। প্রতি দেশের জনবিন্যাসে শিশু একটি বিশেষ বর্গ (Category)হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। ভারত এক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়। এখানে জনসংখ্যার এক বিশেষ অংশ হল শিশু। ১৯৮১ সালের জনগণনায় ভারতে শিশু সংখ্যা ছিল ২৭৩ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ৩৯.৬শতাংশ। ১৯৯১ সালের এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৬ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ৩৭.৬ শতাংশ। ২০০১ সালের জনগণনায় ভারতে শিশুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০.৯ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার ৩৫.৪ শতাংশ হয়ে থাকে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ০ থেকে ৬ বছরের শিশুর সংখ্যা ১৫.৮৭ কোটি। ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১৩.১২ শতাংশ, (২০১১)। ভারতবর্ষে ০ থেকে ৬ বছরের ১ হাজার পুরুষ শিশু প্রতি ৯১৪ জন মহিলা শিশুর সংখ্যা, (২০১১)। এই শিশুরা জনসংখ্যা তত্ত্বের বিচারে "নির্ভরশীল শ্রেণী" বলে উল্লেখিত হলেও এরাই ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের কাণ্ডারী ও কর্মী হয়ে থাকে। শিশুদের সম্পর্কে একটি প্রবচন আছে :"Today's child is tomorrow's citizen"। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভুমিকা নির্ভর করে শিশুর সুষম বিকাশের উপর। কিন্তু বাস্তব চিত্রহল সব শিশু প্রয়োজনীয় সুবিধা পায় না।

শিশুশ্রম বা শিশুশ্রমিক: শিশু অপব্যবহারের একটি বিশেষ দিক হল "শিশুশ্রম"। পরিবার এবং পারিবারিক গণ্ডীর বাইরে শিশুরা বিভিন্ন ধরণের অপব্যবহারের শিকার হয়। যা তাদের শিশুমনেরবিকাশকে ব্যহত করে। এবং তা থেকে উৎপন্ন হয় "শিশুশ্রমিক"। বিশ্বে স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ সমূহে বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ হল "শিশুশ্রমিক"। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতে শিশুশ্রমিকের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কোটিল্যের অর্থশাস্ত্রে শিশু দাস প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পরিবারে নিম্নজাতিভুক্ত ৮ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের পারিবারিক দাস রূপে বিভিন্নকাজে লাগানো হত। পরবর্তী পর্যায়ে জাতিব্যবস্থার নিগড়ে ঐতিহ্যগতভাবে আবদ্ধ শিশুদের পারিবারিক কৃষিক্ষেত্রে, মৃৎশিল্পে, কথনশিল্পে এককথায় পারিবারিক পেশায় সহায়ক এবং শিক্ষানবিশী হিসেবে কাজে লাগানো হত। পারিবারিক স্নেহ ভালবাসার ছত্র ছায়ায় ঝুঁকিহীন কাজে সংযুক্ত থাকায় শিশুর এই ভূমিকা কোনো সমস্যা বলে গণ্য হত না। বরং পরিবারের অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু ব্রিটিশ আধিপত্য কায়েম হওয়ার পর শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে এদেশে পট পরিবর্তন ঘটে। নগরায়ন এবং শিল্পায়ন শহরে নতুন নতুন কর্মোদ্যোগ এবং কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে থাকে। আবার গ্রামীণ ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ভূমি মালিকানার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনে। ভূমির মালিকানা জমিদার শ্রেণীর হাতে চলে যাওয়ায় কৃষিজীবিদের জমির মালিকানা থাকে না। জমিদারের জমি ইজারা নিয়ে চাষ করে ক্ষেত্র মাফসুরৎ বর্ধিত খাজনা নগদে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রদেয় হওয়ায় চাষীর পক্ষে চাষ আর অন্ন জোগায় না। ফলে জীবিকা নির্বাহের তাগিদে রুজি রোজগারের জন্য কৃষককুলের এক বড়ো অংশকে নগরকুলে সামিল হতে হয়। এই 'শিশুরা' শহরের শিল্পক্ষেত্রে লোভনীয় শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম পারিশ্রমিকে বেশি শ্রমঘণ্টার কাজ এদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। এ প্রসঙ্গে "রয়্যাল কমিশন অব লেবার ইন ইণ্ডিয়া" (১৯২৯) এক প্রতিবেদনে বলেন "৫বৎসর বয়স্ক পর্যন্ত শিশুদের মাত্র ২আনা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দৈনিক ১০-১২ ঘণ্টা খাটানো হত যেখানে খাবার সময়টুকু পর্যন্ত দেওয়া হত না। এই ধরণের শিশুশ্রমে স্নেহ মমতার কোন ছোঁওয়া না। ছিল শোষন ও শাসনের ফাঁস।" (উৎস : বেলা দত্ত গুপ্ত ১৯৬৪ : ২২৭)। "দ্যা হুইটলে কমিশন" এইরূপ শোশণ মূলক শিশুশ্রমে যোগদানের কারণ হিসেবে চরম দারিদ্র্যতাকেই চিহ্নিত করেন। এইরূপ শিশুশ্রম পারিবারিক ক্ষেত্রে সুরাহা হলেও 'শিশুর' ক্ষেত্রে সমস্যামূলক হয়ে থাকে। শিশুর পক্ষে অকল্যাণকর এইরূপ শিশুশ্রম বর্তমানেও ভারতীয় সমাজে উপস্থিত থাকে। ভারতবর্ষে গ্রাম এবং শহর এই দুই ভৌগলিক ক্ষেত্রেই শিশুশ্রম পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

শিশুশ্রমের বিভিন্ন দিকও আইনগত পদক্ষেপ: সব দেশের শিশুর কোনো না কোন কাজ করে থাকে। এই কাজ কিছু-কিছু ক্ষেত্রে যেমন—পারিবারিক ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল এবং অর্থকারীও হয়ে থাকে। কিন্তু শিশুর এই কর্মরত ভূমিকা সবক্ষেত্রে শিশুশ্রম বলে ব্যাখ্যাত হয়না। এ সম্পর্কে ধারণাগত দিক থেকে শিশুকর্মী (Child worker) এবং শিশুশ্রমিক (Child labour) এই দুটি ভুমিকার উল্লেখ করা হয়। অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্তার ন্যায় মতাবলম্বনকারীদের মতে এক্ষেত্রে 'শিশুর' ভূমিকা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে 'শিশুশ্রম' বলে অভিহিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'শিশুশ্রম' ব্যাখ্যাত হয় সামাজিক অকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গীতে। এদিক থেকে 'শিশুকর্মী'র অর্থনৈতিক ভূমিকা যদি তার কাছে শোষণমূলক এবং তার শারীরিক ও মানসিক সুষম বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায় স্বরূপ হয় তাহলে ঐ কাজ বা পেশা 'শিশুশ্রম' বলে পরিগণিত হয়। বি. লক্ষপতির মতে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী বিনোদনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ঝুঁকির উপস্থিতি ও শিশুশ্রমের নির্ণায়ক হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষে আইনি এবং সরকারী ব্যবস্থার বয়ঃসীমার মাপকাঠিতে শিশুশ্রমিক নির্ধারিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতে কৃষিক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নির্ধারক বয়ঃসীমা উল্লেখিত আছে। এই বয়ঃসীমা ক্ষেত্র বিশেষে ১২ থেকে ১৫ পর্যন্ত হয়ে থাকে। 'ফ্যাক্টরিস অ্যাক্ট' ১৯৪৮ এতে ১৪ বৎসরের কমবয়স্ক শিশুদের কারখানায় নিযুক্তি নিষেধিত হয়েছে। "প্লান্টেশান লেবার অ্যাক্ট" (১৯৫১), এবং "মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট" (১৯৫৮), এতে ১৫ বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নিয়োগ নিষেধ করা হয়েছে। দি চাইল্ড লেবার (প্রহিবিশান অ্যাণ্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট (১৯৮৬) রেলে যাত্রী যানবাহনে ও পণ্য পরিবহনে বিড়ি প্রস্তুত করন, বস্ত্রবয়ন, সিমেন্ট প্রস্তুতক্রণ, দেশলাই তৈরী, অভ্র কাটাই, চর্মপ্রক্রিয়াকরণ প্রভৃতি শিল্পে ১৪ বছরের কম বয়স্ক শিশুদের নিয়োগ নিষেধ করে থাকে। উল্লিখিত বিভিন্ন আইনে কাজের ক্ষেত্র ও ঝুঁকিপ্রবলতার বিচারে কর্ম-নিযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়ঃসীমা নির্দেশ করা হয়। কিন্তু শিশুশ্রমিকের হার গণনার ক্ষেত্রে ভারতের জনগণনার শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়ঃস্কাল ৫-১৪ বয়ঃসীমাকে শিশুশ্রমিক নির্দেশক বয়স হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এদিক থেকে উপার্জনের জন্য কর্মে নিযুক্ত ৫-১৪ বয়ঃসীমা অন্তর্ভুক্ত শিশুরাই "শিশুশ্রমিক" বলে গণ্য হয়ে থাকে।

পৃথিবীব্যাপী অসহায় 'শিশুশ্রমিকদের' মুক্তি দিতে বৃহত্তর বিশ্বে আইনানুগ নানাবিধ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। উন্নত দেশসমূহে শিশুদের প্রতি যত্নশীল মনোভাব গড়ে ওঠার ফলে সেখানে বহুকাল পূর্বেই আইনানুগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। প্রসঙ্গত ভারতবর্ষে ও 'শিশুশ্রমিক' প্রথা রোধে কতকগুলি আইনী ধারা বলবৎ করা হয়েছে। বলা হয়েছে (২৪নং) ১৪ বছরের নীচে থাকা শিশুদেরকে কোনো শিল্পে কারখানায় বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ অবৈধ। তাদের শৈশব এবং যৌবনকে অপব্যবহার এবং শোষন ৩৯(৬), (চ) করা যাবে না। শিশুশ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষদৃষ্টি দিতে হবে। এছাড়া সাংবিধানিক নির্দেশ অনুসারে যাবতীয় বিধিনিষেধ মেনে চলা বাধ্যতামূলক বলে মেনে চলা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে এম.এস. গুরুপদ স্বামীর প্রতিনিধিত্বে "The National Committee on Child Labour" গঠন করে'The Child Labour Act'-1986 চালু করা হয়। আইনে বলা হয়, প্রতি তিন ঘণ্টা বিশ্রাম দিতে হবে। সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটি থাকবে। শিশুশ্রমিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে এবং শিশু শ্রমিকদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা গড়ে তুলতে হবে।

১৯৮৭ সালের ১২ই আগস্ট ভারতীয় সংসদে জাতীয় শিশু শ্রমিকনীতি গৃহীত হয়। সেখানে আইনগত, উন্নয়ণমূলক এবং পরিকল্পনা মূলক কিছু কর্মসূচী গৃহীত হয়। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের দশটি শিল্পী প্রকল্পে "শিশুশ্রমিক"দের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করা হয় এগুলি হল দেশলাই শিল্প (তামিলনাড়ু), হীরকশিল্প (সুরাট), পাহার শিল্প (জয়পুর), কাঁচশিল্প (উত্তরপ্রদেশ), তালা শিল্প (আলিগড়), আলিচা শিল্প (উত্তরপ্রদেশ ও জম্মু কাশ্মীর), শ্লেট শিল্প (মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ), পিতল শিল্প (মোরাদাবাদ) প্রভৃতি।

প্রভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরসিংহরাও এর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে ২লক্ষ শিল্পশ্রমিকের জন্য ৯০টি জাতীয় শিল্প প্রকল্প চালু করা হয়। এর অধীনে প্রায় ১০০০টি প্রকল্প চালু হয়। ১৯৯৬ সালে ১০ই ডিসেম্বর ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট কতকগুলি বিশেষ আদেশ জারি করে সেই অনুসারে শিশুদেরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগের জন্য নিয়োগকারীকে ২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই অর্থে শিশুদের পূনর্বাসন এবং কল্যাণমূলক কাজ সম্পন্ন হবে। কাজ থেকে সরিয়ে আনা শিশুদের পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্কদের চাকরি দিতে হবে অথবা ৫০০০ টাকা কল্যাণ তহবিলে জমা দিতে হবে। অর্থ অনাদায়ে সুদ দিতে হবে এবং শিশু শ্রম থেকে সরিয়ে আনা শিশুদের যথাযথ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুশ্রমিকের হার: ভারতে শিশুশ্রমিক হার নির্দেশের ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী হিসেবের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জনগণনার হিসেবে ভারতে শিশু শ্রমিকের ক্রমহ্রাসমান হার দেখা যায়। ১৯৬১ সালের জনগণনায় শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৪.৫ মিলিয়ন যা ১৯৭১ সালে কমে দাঁড়ায় ১০.৭ মিলিয়ন। ১৯৮১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায়

১৩.৬৪ মিলিয়ন। কিন্তু বরোদা :অপারেশন রিচার্সক্রুপ এর হিসেবে এই সংখ্যা হয় ৪৪ মিলিয়ন। জনগণনায় হিসেবে ওই বৎসর শিশু শ্রমিক সংখ্যা ২৬.৪৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

আবার ১৯৯১ সালে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১১.২৮ মিলিয়ন। জনগণনার হিসেবে এই সমসীমায় শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ১৭.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য এন.এস.এস ও কৃতনমুনা সমীক্ষায় ১৯৮৫ সালেই ভারতে ১৭মিলিয়ন শিশুশ্রমিকের উপস্থিতি উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ১৯৯১ সালে UNICEFএর একটি প্রতিবেদনে (ইউ.এন.আই.সি.ই.এফ, ১৯৯১ চিল্ড্রেন অ্যাণ্ড ওমেন ইন ইন্ডিয়া-এ সিচুয়েশান অ্যানালিসিস ১৯৯০ নিউ দিল্লী: ইউ.এন.আই.সি.ই.এফ ইন্ডিয়া অফিস) বলা হয় যে অন্যান্য দেশের চাইতে ভারতে সর্বাধিক শিশুশ্রমিক উপস্থিত থাকে। ১৯৯৫ সালের ২০ মার্চ কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী স্বয়ং রাজ্যসভায় ঘোষণা করেন যে ভারতে ১৭ মিলিয়ন শিশুশ্রমিক উপস্থিত থাকে যার মধ্যে ৯.৫ মিলিয়ন পুরুষ এবং ৭.৫ মিলিয়ন নারী (দি হিন্দুস্থান টাইমস্ ২১.৩.৯৫)। ফ্রি দি চিল্ড্রেন - ইন্ডিয়া ক্যালকাটা চ্যাপটার-এর প্রতিবেদনে বলা হয় ভারতে ১২৫ মিলিয়ন শিশুশ্রমিক থাকে যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে থাকে ৬.৫ মিলিয়ন (দি স্টেটস্ম্যান ২.২.২০০০)। অতি সাম্প্রতি প্রতিবেদন অনুযায়ী "শিশুশ্রমিকের" সংখ্যা ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২৬ লক্ষ (২০০১)। তারপরের প্রতিবেদন অনুযায়ী "শিশুশ্রমিকের" সংখ্যা ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশুর সংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ২৪৭ (২০১১ রিপোর্ট)। উষা কানহার প্রদত্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতে ৯১ শতাংশ "শিশুশ্রমিক" গ্রামে এবং ৯ শতাংশ শিশুশ্রমিক শহরে থাকে।

শিশুশ্রমিকের বিভিন্ন ক্ষেত্র: গ্রামীন ক্ষেত্রে শিশুরা কৃষিসংক্রান্ত এবং আনুষাঙ্গিক কর্মে যেমন— বীজবপন, শস্যকাটা, গবাদী পশু চারন করা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পানীয়জল আনা, মাছ ধরা প্রভৃতি কাজে রত থাকে, পারিবারিক পেশার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের পরিচ্ছদ শিল্প, কেরলের নারকেল ছোবড়ায় আঁশজাত শিল্প উল্লেখযোগ্য, অধ্যাপক এস.বি.সাকসেনা গুজরাটের ভারুচ জেলায় মিনামাতার গ্রামে সমীক্ষা করে দেখান যে ৭২ শতাংশ শিশুশ্রমিক কৃষিকাজে, ১৪ শতাংশ কৃষিকাজ ও পশুপালনে এবং ১২ শতাংশ কৃষি ও গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকে। ৯৮ শতাংশ শিশুশ্রমিকে প্রত্যহ ৮-৯ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। তারা দৈনিক ৪-১০ টাকা গড়ে ৭.৪৫ টাকা মজুরী পেয়ে থাকে।

শহর এলাকায় বেশির ভাগ শিশুশ্রমিক ছোটো কারখানায়, দোকানে, রেস্তোরাঁয়, হোটেলে, গ্যারেজ এবং পেট্রোল পাম্পে, গৃহেভৃত্য হিসেবে, রাস্তায় ফেরিওয়ালা হিসেবে ও পতিতাবৃত্তি, চোরা পাচার মদক পাচারের ন্যায় অসামাজিক কর্মে লিপ্ত থাকে। এইসব ক্ষেত্রে কর্মরত শিশুদের অবস্থা করুন হয়ে থাকে। দিল্লীতে প্রায় ৬০,০০০ 'শিশুশ্রমিক' দৈনিক ৮-১০টাকা পারিশ্রমিকে হোটেল, ধাবা, রেস্তোরাঁয় কাজ করতে হয়, ফিরোজাবাদের কাঁচ শিল্পে, তামিলনাড়ুর শিবকালী আত সবজী এবং দেশলাই প্রস্তুত শিল্পে, জম্মু ও কাশ্মীরের গালিচা শিল্পে উত্তর প্রদেশের মির্জাপুরে হীরক কাটাই শিল্পে,সুরাটের জরির কাজে, আলীগড়ের তালা তৈরীর কাজে, দার্জিলিং এর চা বাগিচা ক্ষেত্রে এবং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'শিশুশ্রমিকদের' কর্মে নিযুক্ত হতে দেখা যায়। পূর্বে উল্লেখিত ফ্রি দি চিল্ড্রেন ইন্ডিয়া, ক্যালকাটা চ্যাপ্টার এবং সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কলকাতা পুরসভার একটি ওয়ার্ডে আলিমুদ্দিন স্ট্রীট, ইমদাদ স্ট্রীট, কলিনস স্ট্রীট, নবাব আব্দুল লতিফ স্ট্রীট এবং শরিফ লেনে ২৫৫টি ক্ষুদ্র শিল্পে ১০০০এর বেশি শিশুশ্রমিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত থাকে। ঘিঞ্জি, অন্ধকার, নোংরা শিল্পে শিশুদের ৮০০.০ সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কাজ করতে হয়। সপ্তাহে কোনো ছুটি থাকে না। তাদের শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের কোনো সুযোগ থাকে না। থাকে না অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা। পারিবারিক স্নেহ ভালবাসা ও সুরক্ষামূলক পরিবেশের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু কর্মক্ষেত্র ছেড়ে পালাতে গেলে তাদের উপর নেমে আসে যথেষ্ট শারীরিক নির্যাতনও বিড়ম্বনা।

শিশুশ্রমের কারণ: (একজন শিশুকে শিশুশ্রমিক হয়ে ওঠার পেছনে কারণগুলি নিম্নে উল্লেখিত)— শিশুদের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পেছনে অর্থনৈতিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত কারণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক কারণ বলতে পারিবারিক দারিদ্রকে নির্দেশ করা হয়ে থাকে। পারিবারিক কারণ বলতে পরিবারে উপার্জনকারী সদস্যের অকালমৃত্যু, স্থায়ী রোগভোগ, শারীরিক অক্ষমতা, নেশাগ্রস্ততা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ হেতু শস্য হানি প্রভৃতিকে বোঝায়। ব্যক্তিগত কারণ বলতে শিশুর পড়াশোনার গাফিলতি হেতু কর্মে যোগদানকে বোঝায়। অনেক সময় অর্থের মোহে শিশুরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে থাকে। প্রথাগত শিক্ষা বাস্তবে উপার্জনের ক্ষেত্রে নিশ্চিত দিশারী না হওয়ায় এবং শিক্ষন পদ্ধতিও শিশুদের কাছে চিন্তাকর্ষক না হওয়ার নিম্নবর্গীয় পরিবারের শিশুরা শ্রমজগতে প্রবেশ করে থাকে। যার ফলেই গড়ে উঠছে "শিশুশ্রমিক"। যা সমাজে একটি সমস্যা রূপে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

শিশুশ্রমিকদের জন্য সরকারী পদক্ষেপ: আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের (ILO)"শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রন বিষয়ক কিছু গৃহীত নীতি যেমন, ১৪ বৎসর বয়সের নিচে শিশুদের কোনো শিল্পে নিয়োগ না করার আই.এল.ও কনভেনশন নং ৫, ১৯৯৯ অনুসরণ করে ভারতে বরাবরই শিশুশ্রম নিয়ন্ত্রন অনুকুল কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

- ❖ সংবিধানের ২৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৪ বছরের নীচে কোন শিশুকেই কারখানায়, খনিতে বা অন্য কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা যাবেনা।
- ❖ সংবিধানের ৩৯(এ) এবং (চ) অনুচ্ছেদে শিশুদের অল্পবয়সে অপব্যবহার না করা এবং শৈশব ও যৌবনকে শোষণ নৈতিক বাস্তব পরিহার থেকে সুরক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।
- ❖ সংবিধানের ৪৫ নং অনুচ্ছেদে শিশুদের ১৪ বৎসর বয়স সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ❖ আইনগত দিকে উল্লিখিত সাংবিধানিক নির্দেশাবলী বাস্তবায়িত করার জন্য নির্দিষ্ট বিধি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ফ্যাক্টরিস অ্যাক্ট (১৯৪৮), মিনিমাম ওয়েজস অ্যাক্ট (১৯৪৮), মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কস অ্যাক্ট (১৯৫১), প্ল্যানটেশনস অ্যাক্ট (১৯৫১), মাইনস অ্যাক্ট (১৯৫২), মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট (১৯৫৮), আপ্রেন্টিস অ্যাক্ট (১৯৬১) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
- ❖ শপ অ্যান্ড এষ্টাব্লিশমেন্ট অ্যাক্টে ৫-৭ ঘণ্টা কাজের নির্দেশ করা হয়েছে।
- ❖ "শিশুশ্রমিক" কল্যাণ সাধনের জন্য আমাদের জাতীয় সরকার ১৯৭৯ সালে এ,.এস.গুরুপদ স্বামীর নেতৃত্বে "দি ন্যাশনাল কমিটি অন চাইল্ড লেবার" গঠন করেন। ১৯৮৬ সালে দি চাইল্ড লেবার (প্রহিবিশান অ্যান্ড রেগুলেশান) অ্যাক্ট করা হয়। এই আইনে বিভিন্ন ঝুঁকিপ্রবল ক্ষেত্রে শিশুশ্রমিকদের প্রতি ৩ ঘণ্টা কাজের অন্তরে ১ ঘণ্টা অবসর দেওয়া, সপ্তাহে একদিন সবেতন ছুটি দেওয়া এবং "শিশুশ্রমিক"দের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। এই আইন প্রণয়নের পরেই ভারতে "জাতীয় শিশুশ্রমিকনীতি" ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৭ সালে ১২ই আগষ্ট ভারতীয় সংসদে শিশুশ্রমিক সংক্রান্ত একটি পূর্নাঙ্গ জাতীয় নীতি ঘোষণা করা হয়। এই নীতিতে তিনটি কর্মসূচীর উল্লেখ করা হয় :-
  (ক) আইনগত কর্মসূচী।
  (খ) শিশুশ্রমিকদের স্বার্থে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী এবং
  (গ) শিশুশ্রমিক অধ্যুষিত ক্ষেত্রে বা এলাকায় পরিকল্পনা মাফিক কর্মসূচী।

শিশুশ্রমের পরিপেক্ষিতে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী: উল্লিখিত কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলী "শিশুশ্রমিকদের" দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রভূত অশুভ প্রভাব ফেলে থাকে। ধূলা, ময়লা যুক্ত আর্দ্র ও অন্ধকার পরিবেশে কাজ করার ফলে "শিশুশ্রমিক"দের বিভিন্ন চর্মরোগ, ব্রঙ্কাইয়টিস ইত্যাদির শিকার হতে হয়। ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া বিশ্রাম না থাকায় তাদের অপুষ্টি, রক্ত শূন্যতা এবং যক্ষার শিকার হতে হয়। সমাজে একজন শিশু জন্ম গ্রহণের পর সামাজীকরণের মাধ্যমে সে যখন বড় হয় তার সুষম বিকাশ প্রয়োজন, কিন্তু একজন "শিশুশ্রমিক" তা হয় না।

অল্পবয়সে নির্মম বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে শিশুদের কোমলমন ভারাক্রান্ত এবং 'অকাল পক্ক হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ শিশুশ্রমিকই দারিদ্রক্লিষ্ট তফশিলী জাতি ও অন্যান্য নিম্নজাতি বা মুসলমান সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত পরিবার থেকে আসায় তাদের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয় না। কর্মে প্রবেশের পরও কোনো সহায়ক শিক্ষার সুযোগ থাকে না। ফলে বয়ঃসিদ্ধি ঘটলে যথেষ্ট শিক্ষার অভাবে তাদের "উর্দ্ধমুখী সামাজিক সচলতা" ঘটার সম্ভাবনা থাকে না। সমাজতাত্ত্বিকদের মতানুসারে-শিশুশ্রম হল মূল্যবান শ্রমশক্তির অপচয়, জাতির উন্নতির ক্ষেত্রে অকালব্যয়, কোনো সঞ্চয় নয়। এদিক থেকে শিশুশ্রম একটি সামাজিক সমস্যা হয়ে থাকে। যা নিবারণ করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ভারতীয় সরকার উল্লিখিত নির্দেশগুলি যথার্থ রূপায়নে সচেষ্ট আছে তবে "শিশুশ্রম" নিবারণের জন্য শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করা দরকার। এবিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে গণমাধ্যমে সম্প্রচার বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। কিন্তু শিশুর পরিবারের সক্ষম সদস্যের নূন্যতম মজুরীতে কর্ম নিয়োগ ব্যবস্থা না করলে সচেতনতা বাড়ানোর কর্মসূচী কার্যকরী হয়না। এক্ষেত্রে সরকারী প্রচেষ্টার সাথে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং শ্রমিক সংঘের যৌথ প্রয়াস সার্থক হয়ে থাকে। শিশুশ্রম হল একটি সামাজিক সমস্যা। যার ফলে সমাজের একটি কু-প্রভাব বর্তমান থাকে। আমাদের এই "শিশুশ্রম" এর মত কু-প্রভাব যা একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা তা

সমাজ থেকে দূরীভূত করা আমাদের একমাত্র দায়িত্বও কর্তব্য বলে আমাদের মনে করা উচিত। যা সমাজের বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। রামানুজ গাঙ্গুঁলীও সৈয়দ আব্দুল হাফিজ মইনদ্দিন, সমকালীন ভারতীয় সমাজ
২। চৌধুরী ড. অনিরুদ্ধ, ড. কৃষ্ণদাস চট্টোপাধ্যায়, ড. শান্তনু ঘোষ, ভারতের সামাজিক সমস্যা, চ্যাটার্জি পাবলিশার্স।
৩। সমাজতত্ত্বের রূপরেখা, কর পরিমল ভূষণ ।